# প্রথম অধ্যায়

## বিশ শতকের অন্ত্যলগ্ন ঃ সময়ের স্বর ও স্বরান্তর

[১]

'কলকাতা একাত্তর' - মৃণাল সেনের একটি ছবি। সেখানে একটি ছেলের কথা আছে। ছেলেটি শুধু বয়ে বেড়ায় হাজার বছর ধরে কুড়ি বছর। কারণ মরবার জন্যই তাকে বারবার জন্মাতে হয়। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের নানা ছবি - কলকাতা ও তার আশেপাশে টেলিভিশন এল, সস্তার রেফ্রিজারেটার মধ্যবিত্ত ঘরের 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হল, নানা রকমের ভোগ্য পণ্যের সাথে মদের দোকানে অনেকের অনেক টাকা উড়তে লাগল, স্টেনলেস স্টিলের তৈজস পত্রে ঘর ভরে গেল, কাঁসা-ভরণ-পিতল বিদায় নিল, ফ্ল্যাট বাড়ির বুকিং শুরু হয়ে গেল, গাড়ির সংখ্যা হু হু করে বাড়ল, পেট্রোলের দাম, টু-হুইলার এখন শুধু ধনীদের নয়, মধ্যবিত্তেরও আয়ত্তে এসে গেল। শুধু ব্যাঙ্ক নয়, নানা অর্থ লগ্নী সংস্থায় টাকা ডবল করার প্রাণপাত চেষ্টা, কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর উপচে পড়া ভিড়, অফিসে 'নো ভ্যাকেন্সি'। শুধু এরই মধ্যে অনেকের স্মৃতির গহনে লুকিয়ে থাকে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দিনগুলির কথা- যখন পরোপকার ছিল মূল্যবোধ গুলির মধ্যে অন্যতম। যে আদর্শ একসময় শুধু স্বপ্নমাত্র ছিল না, ছিল বাস্তব সত্য, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সেই আদর্শচ্যুতিতে কোনো বিবেকের দংশন কেউ অনুভব করত না বললেই হয়।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক এপার বাংলায় ছিল সত্যিই এক ঘোর লাগা সময়। নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো মতে যেন বেঁচে ছিল কিছু মানুষ। চারিদিকে ফেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে। মাঝে মাঝে যুদ্ধের জিগির উঠছে। কিছু মুখোশধারী তস্কর কেড়ে নিচ্ছিল সাধারণ মানুষের সর্বস্ব। অনেকের মধ্যেই সে সময়ে লোপ পেয়েছিল প্রতিবাদের সৎসাহস। সে সময় মনে হয়েছিল, দু-টুকরো হওয়া বাংলাদেশও আর থাকবে না। আজ মনে হয়, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক এক তমিস্রার সময়। সে সময় কারো মনে শান্তি ছিল না। কবি সমর সেন তাঁর 'ঝড়' কবিতায় লিখেছেন, 'আমার মনে শান্তি নেই / যদি ঝড় নেমে আসে / শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে / অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে,

ঝড় নেমে আসে বিশাল অন্ধকারে / তাহলে হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।' দেশে তখন ঘনায়মান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের অভিঘাত। এর প্রভাব শুধু সামাজিক শ্রেণিগুলির ওপরে নয়, ছাত্রদের ওপরে পড়েছিল । দেশ জুড়ে ছাত্র বিক্ষোভের ঢেউ ভারত সরকারের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এর একটা বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপট ছিল। ভিয়েতনামের মুক্তি যুদ্ধ, আফ্রিকা, এশিয়া, এবং লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিশ্বের যুব ছাত্র সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল । এদেশের ছাত্ররাও আর গতানুগতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনে যোগ দিয়ে খুশি হচ্ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক, মরশুমি, মামুলি ছাত্র আন্দোলনের বাইরে বৃহত্তর কোনো এক আন্দোলনের দিশা খুঁজছিল ছাত্র সমাজ। একটা অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল 'র‍্যাডিক্যাল থিংকিং'। তারা চাইছিল গোটা সমাজ ব্যবস্থার সমূল উৎপাটন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে শ্রমিকের লড়াইও অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার বাংলায় অব্যাহত ছিল । সস্তাদরের খাদ্যের দাবিতে, মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, বীভৎস হত্যালীলার বিরুদ্ধে চলছিল আন্দোলন, মিছিল, ধর্মঘট। একই সঙ্গে চলছিল পুলিশের লাঠি, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে ডি.আই রুল প্রয়োগ। সস্তাদরের খাদ্য ও ন্যায্য মূল্যের জিনিসের দাবিতে গ্রামে শহরে সামিল হয়েছির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। সর্বত্রই চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলছিল। বড় চাষি ও জোতদারেরা ধান লুকিয়ে ফেলছিল। কারণ তাদের প্রত্যেকের ওপরেই 'লেভি' ধার্য করা হয়েছিল। দিনে চাল নেই, কিন্তু রাত দশটার পর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বস্তা দরে ধান পাওয়া যায় - যদি সেই টাকাটা আগাম রেখে আসা যায়। ছেলেদের সাথে দলে দলে দুঃস্থ মেয়েরা সে সময় চাল পাচারে নেমে পড়েছিল। তারা ভোর রাতে কাজে লেগে যেত। মান-সম্ভ্রম ও নারীত্বএ ক্ষেত্রে তখন ছিল মুলতুবী। মায়ের সাথে বাচ্চারা এই 'বেআইনি' পেশায় যোগ দিয়েছিল। ঘি আর সর্ষের তেলের ছোট ছোট টিনে চাল ভরে তারা লোক্যাল ট্রেনে দিনে চার পাঁচবার যাতায়ত করত। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জমা হচ্ছিল পাহাড় প্রমাণ অসন্তোষ ও বিক্ষোভ। রক্ত আর আগুনের মিতালিতে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে জন্ম নিয়েছিল এক নুতন দৃশ্যপট। অহিংসার নামাবলীর আড়ালে তখন সরকাররূপী নেকড়ের হিংস

থাবা থেকে অঝোরে ঝরছিল রক্ত । প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখার রূপ নিচ্ছিল । সারা বাংলার মানুষ বিক্ষোভে সামিল হচ্ছিল । গ্রামের চাষি আর শহরের কল-কারখানায়-অফিসে-আদালতে খেটে খাওয়া শ্রমিক আর কর্মচারিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল দেশের ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায় । সরকার এক আদেশ বলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুল-কলেজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল । জেলখানাগুলোর নাম তখন 'সংশোধনাগার' ছিল না । সেখানে অসংখ্য বন্দীদের মধ্যে ছিল দুধের বাচ্চা যাদের সর্বাঙ্গে ছিল প্রচন্ড মারের দাগ ও রক্তাক্ত ক্ষত । এইসব কিশোরদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ জেলের চৌহদ্দি সর্বদাই ভারি করে তুলত । ওরা রাতের বেলা মা-ঠাকুমা বাবা-কাকাদের নাম করে কেঁদে উঠত । লোকের মুখে মুখে তখন ছিল খুন-জখম আর পুলিশি সন্ত্রাসের কাহিনি ।

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে উদ্বাস্তু পল্লীগুলোর অবস্থা ছিল আশাহীন অন্ধকারের পর্দা দিয়ে ঢাকা । জন্মাবধি অভিশপ্ত ছিল উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের অস্তিত্ব, ছিন্ন ভিন্ন তাদের শৈশব । 'মার্জিন্যাল ম্যান'-এর ৩৯৪-৯৫ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে অমলেন্দু সেনগুপ্ত আমাদের জানাচ্ছেন, 'তারা জন্মেছে ও বেড়ে উঠেছে সেইসব ঝোপড়িতে যা রেলপথের দুধারে গজিয়ে উঠেছে । শিয়ালদহ থেকে কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ডহারবার, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ এবং হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি রেলপথের দুধারে চোখে পড়ে শত শত ঝোপড়ি আর চোখে পড়ে মশা-মাছির মতো থিক থিক করা অস্নাত, অভুক্ত, নগ্ন, অর্ধনগ্ন বালকের দল । সারাদিন তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায় । পাখির মতো দুটো ভাত, এক টুকরো রুটি পেলে খুঁটে খুঁটে খায় । অধিকাংশ দিন কিছুই জোটে না তাদের । কেউ তাদের দুটো ভালো কথা বলেনি, তাদের জন্য কারো মায়া মমতা, দরদের ছিটে ফোঁটাও বরাদ্দ নেই । অন্যদের কথা দূরে থাকুক, এমন কি তাদের মা-বাবারা তাদের খোঁজ রাখে না । তারা এই দেশের, এই সমাজের, অথচ তারা খারিজ, বেওয়ারিশ অনাহুতের দল । দশ বছর বয়সেই তারা সাবালক স্বাধীন । তাদের মতো সমবয়সীরা একজোট, কারণ সবাই ক্ষুধার্ত । আর কিছু চায় না তারা, শুধু দুবেলা পেট ভরে খেতে চায় । তাই হরতালের দিন যখন স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অচল, সেদিন তাদের রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ । প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এই শিশু-ভৈরবের দল মেতে

উঠে ধ্বংসলীলায় । কারণ তাদের কাদামাখা, নোংরা ছোট্ট শরীর ছাড়া আর যে কিছুই হারাবার নেই ।''

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের এই আন্দোলন থেকে সি. পি. এম. যথেষ্ট লাভবান হয়েছে । রাতারাতি এই পার্টি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায় । যাবতীয় হিংসাত্মক ঘটনার জন্য 'সরকার' সি. পি.এম. কে দায়ী করে যত বিবৃতি দিতে থাকে, ততই লোক সমাজে পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে । সি. পি. এম. এই আন্দোলন থেকে নির্বাচনী ফায়দা তোলে । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আরও প্রায় দশক দুয়েক আগে থেকেই রাজনীতির আওতায় আসতে শুরু করেছিল বালক-কিশোর, তরুণ, ছাত্র-শিক্ষক, মজুর-কর্মচারী সবাই । র‍্যাডিকাল পত্র পত্রিকা বেরোচ্ছিল অজস্র ও নতুন নতুন । 'দক্ষিণদেশ', 'লালতারা'. 'অনীক', 'নন্দন'-কয়েকটি মাত্র নাম । জানার, পড়ার আগ্রহ বেড়েছিল । তরুণ ছাত্রদের মধ্যে মার্কস, লেলিন, মাও-সে-তুং-এর রচনা পাঠ করার ঝোঁক লক্ষণীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছিল । রাজনৈতিক আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের ঝাঁঝালো পরিবেশ শুধু কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কলকাতার বাইরের নানা ছুটকো চায়ের দোকানে ও কেবিনে ছড়িয়ে পড়েছিল । আড্ডায় রাজনীতি ছিল এক অন্যতম বিষয় । এরই পাশাশাশি কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে চলছিল মিছিল । তারা 'লড়াই লড়াই লড়াই' করে মরতে চায়নি, লড়াই করে বাঁচতে চেয়েছিল । সেদিন শুন্যে ছুঁড়ে দেওয়া ঘুঁসির সাথে শ্লোগান ছিল, 'তোমার নাম আমার নাম / ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম ।' বিশ্বের যেখানেই মুক্তি সংগ্রাম চলুক না কেন, সব মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ভাই, সব মুক্তিযুদ্ধেরই তারা শরিক । তারা সেদিন বিশ্বাস করেছিল যে লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা ঘটেছে, বাংলাদেশেও তা ঘটবে । যেসব মানুষ এই সব মিটিং-মিছিলের বাইরে ছিল তারাও সে সময় টের পেয়েছিল একটা কিছু ঘটবে । বিপ্লব না হলেও বড় রকমের একটা ওলটপালট । আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের এই ভাবনা হাওয়ায় হাওয়ায় রটে যায়, 'এবার কংগ্রেস ডুববে ।' শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের আসন্ন ছায়া, দেশ রক্ষার নামে সরকারী মহলে স্বৈরাচার বজায় রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা, ভারতের অর্থনীতিতে

দেশি-বিদেশি বৃহৎ ক্রমবর্ধমান কব্জা, সাম্রাজ্যবাদীর চাপে পররাষ্ট্রনীতির কাছে ক্রমিক আত্মসমর্পন- পরিস্থিতির এই ভয়াবহ ক্রমাবনতির একটি মাত্র প্রতিকারের পথ ছিল জনগণের বিপুল শক্তিকে উদ্বোধিত করে প্রক্রিয়ার পাল্টা আক্রমণ । দ্রুত বদলাতে থাকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের চালচিত্র । কোনো রাজনৈতিক কর্মী অবাধে চলাফেরা করতে ভরসা পায় না । বিশ্বস্ত জননেতা, শিক্ষাব্রতী, চিকিৎসক, ছা-পোষা মানুষ-সকলের জীবন আক্ষরিক অর্থে বিপন্ন । 'সকলেই আজ সন্ত্রস্ত । নকশাল পন্থীরা সন্ত্রস্ত, সি পি এম সন্ত্রস্ত,প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা, এম. এল. এ., শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, শ্রমিক কেরানি, সরকারি অফিসার, পুলিশ, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, অভিনেতা- অভিনেত্রী, রোগী, ডাক্তার, মোক্তার, জজ, উকিল, ফরিয়াদী-আসামী, সর্বশ্রেণির লোক, ছেলে মেয়ে বুড়ো প্রত্যেকেই আজ পোষাকের তলায় থরথর করে কাঁপছেন । রাজনৈতিক নেতারা যে সব খুনীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তারা আজ এমনই পেশাদার হয়ে উঠেছে যে দাদাদের শাসন আর মানতে চাইছে না পাইপগান আর রিভলভারের নলই যে ক্ষমতার উৎস এ তারা বুঝে ফেলেছে ।[২]

এই রক্তাক্ত সময়কে কবি রাম বসু তাঁর 'কানামাছি' কবিতায় তুলে ধরেছেন এই ভাবে, 'চোখে ছানি,হাতে ছোরা, রক্তাক্ত সময় / মাটিতে লুণ্ঠিত লাল হিম দেহে জেগে আছে ছুরি / নিভে যায় পড়শিদের সতর্ক জটলা / কিছু পরে সাজানো সংসার, সাজা, সিনেমা, বোনাস / পুনরায় খুনখোর মিছিলে সংগ্রামী / ধোঁয়া ওঠা ঘেয়ো দৃশ্যপট ।'

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কিছু আগে এই 'বিশেষ সময়' পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে লেপে দিয়েছে রক্তের কালি । খুন আর রক্ত । মানুষের সমস্ত চেতনা জুড়ে ছিল তারই আধিপত্য । খুনের হার সে সময় বেড়ে গিয়েছিল । খুনের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কারো পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না । সমস্যার শেষ এখানেই নয় । রাজনৈতিক দলাদলির সঙ্গে সন্ত্রাস, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, নারী নির্যাতন, মধ্যবিত্ত-অবলুপ্তি, শিক্ষার সংকট, ক্রমবর্ধমান লোডশেডিং, টেলিফোনের অচলতা, বাংলায় অবাঙালির অবারিত আগমন, কর্ম সংস্থানের ওপর প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্যা ---- জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রকাশ ঘটেছিল । রাজনীতি থেকে

শুরু করে সাহিত্য ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্র চলেছিল নির্লজ্জ গোষ্ঠী-তোষণের অব্যাহত লীলা। চতুর্দিকে দেখা দিয়েছিল ভণ্ডামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। বস্তুত সমকালীন বিশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হ্রাস ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল যে, বাঙালির চর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে কি না। 'অশন-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালি আজ যেমন নিজেকে বহুরূপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।'[৩]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা ও বাঙালি সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই শুধু নয়, উচ্চ ও নিম্নবিত্ত সমাজের অন্দর মহলেও পরিবর্তন ঘটে গেছে। রক্ষণশীলতার দুর্গ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বাড়ির অন্দর মহলে ঘোমটা দিয়ে বেড়ানো দূরে থাক, বাড়ির বাইরেও মেয়েদের ছিল অবাধ গতি। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি সমাজে ভাসুর-ভাদ্দর বৌয়ের সম্পর্কের মধ্যে চৈনিক প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল। পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশায় কোনো বাধা ছিল না। নাগরিক চাল-চলনের প্রভাবে অতি দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছিল গ্রাম-জীবন। পুরুষদের সাথে জীবনের তাগিদেই মেয়েরা নানা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্ম গ্রহণ করল। গ্রামবাংলা ও শহরতলীর নারীরা পেশার তাগিদে শহরমুখী হল, মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার হার দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে রক্ষণশীল মনোভাবের ভিত নড়ে উঠল, পাপ- পুণ্যের বিচার-দণ্ডটা খসে পড়ল তথাকথিত সমাজপতিদের হাত থেকে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, সমাজের নানাস্তরে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে যেতে থাকে। যে রূপান্তরটা এই সময়ে ঘটে গেল তা একেবারে অবিশ্বাস্য। নামজাদা ডাক্তার, আইনজীবি, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিকা, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, কোম্পানি একজিকিউটিভ, কোম্পানি ডিরেক্টরদের এখন আর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দর মহল পর্যন্ত গোবর জলের ছিটে দিতে হয় না। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে বর্ষীয়সী মহিলাদেরও নিত্য গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন হত না। খোস-পাঁচড়ার প্রকোপ কমে যাওয়ায় গ্রামেও সে সময় ঘেঁটু পুজোর

প্রচলন একেবারেই ছিল না বললেই হয়। বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণ সে সময় মোটামুটি বিদায় নিয়েছিল। শুধু সীমান্ত অঞ্চলে টিকে ছিল টুসু, ভাদু প্রভৃতি পরব ও লোক-উৎসব। এই সময়ে শুধু ধর্মীয় নানা পরবের অবলুপ্তি ঘটেনি, সামাজিক উৎসব গুলির অধিকাংশ উঠে গিয়েছিল, কোথাও স্ত্রী-আচারগুলো একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অসবর্ণ বিবাহেও কোনো বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণরা ভোজনের নিমন্ত্রণ পেতেন না। অশৌচের কালসীমা কমে গিয়েছিল, নামকরণের 'নিউ ওয়েভে' সাতকড়ি, তিনকড়ি, আন্নাকালীর বদলে এল বিপাশা, মানালী, তিস্তা। নারী-পুরুষের পোষাকে পরিবর্তন ঘটেছিল। খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনকে শুধু সহায়তা নয়, ত্বরান্বিত করেছিল মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ, শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য-সৃজন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহন ব্যবস্থা এবং নানা প্রদেশের বিদেশীয় লোকের সংস্পর্শ। শাড়ির পাশাপাশি এসেছিল প্যান্ট, ম্যাক্সি ও স্কার্ট। পুরুষেরা ধুতির ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে লুঙ্গি ও প্যান্ট পরার দিকে আরো বেশি করে ঝুঁকেছিল। বিংশ শতকের শেষের তিন দশকে সামাজিক রূপান্তরের গতি যে রকম দ্রুত হারে চলছিল তাতে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের মৌলিক উপাদানগুলির ক্রমশই অবলুপ্তি ঘটেছিল। বাঙালি সমাজের এই রূপান্তর প্রসঙ্গে ড° অতুল সুর তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন' গ্রন্থের ৩৬৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে বাঙালি সমাজের রূপান্তরটা মাত্র নাগরিক সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করেনি, গ্রামীন সভ্যতাকেও করেছে। যারা প্রথম গ্রামকে শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল, আজ তারা বিপরীত প্রক্রিয়ায় চলেছে। আজ গ্রামের লোকেরাই শহরকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতার চটক আজ গ্রামের লোকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে বাঙালি তার স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বিনিময়ে।

এবার ওপার বাংলার কথা। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল পূর্ব বাংলার জনগণ। সীমান্তের ওপারের মুক্তিযুদ্ধের কলরোল মুখর হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পাতা। জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধে বাংলাদেশের সর্বত্র সামরিক বাহিনী পর্যুদস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করে। পুলকিত

ও শিহরিত এপার বাংলার সংগ্রামী মানুষের দেহ-মন। সহমর্মিতার আবেগে ধুয়ে মুছে যায় নৈরাশ্য ও পরাজয়ের গ্লানি। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে এপারে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার যুবমনের একমাত্র অভিব্যক্তি, 'আমরা যা করতে চেয়েছি অথচ পারিনি, ওরা তা পেরেছে।' পূর্ববাংলার আগুনে পশ্চিমবাংলার যুবশক্তি প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওপার-এপার বাংলার মানুষ একই আবেগের শরিক হয়েছিল সেদিন। কলকাতার ছাত্র মিছিল থেকে স্বতস্ফূর্ত আওয়াজ উঠেছিল, 'বাংলাদেশের অপর নাম. ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।' দেশ বিভাগের শিকার হয়েছিলেন যাঁরা এক সময়ে তাঁদের মধ্যে অখণ্ড বাংলার স্মৃতি আবার দপদপিয়ে উঠেছিল। এই স্মৃতি বিমোহিতের মধ্যে বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের কবিরাও ছিলেন। তাঁদের কবিতায় দু'বাংলার নদী-নালা, হাট-বাজার, গাঁ-গঞ্জের গাছ-গাছালি ধরা দেয়, ধরা দেয় লোক জীবনের নানা উপাদান। আবেগের স্রোতে মিলিয়ে যায় দু'বাংলার কবিদের আন্তর্জাতিক সীমানা। আবিষ্ট হয়ে সেদিন এপার-ওপার বাংলার কবিরা তাঁদের কবিতায় তুলে ধরেছিলেন ঘু ঘু ডাকা চৈত্রদিনের ছবি, বাদল দিনের কদম-কেশরের কথা, মাটির উনুন, শীতল পাটির সুখ, হাত-পাখা, আশার পিদিম, ফড়িং-এর জলের উপর নাচ, বিকেল বেলার রোদে সাঁকো- এরকম কতো লোকোপাদান, কতো লোকলোর বিষয়ক চিত্রকল্প।

সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকটি বাংলাদেশে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই হল এর একমাত্র কারণ। আর সেই কারণেই বাংলাদেশের কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নটি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। পাকিস্তানি সৈন্যদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ঘৃণা যেমন কবিতায় এসেছে, তেমন মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালি জাতির স্বপ্ন হতাশা, আকাঙ্খা, অকৃত্রিম মমত্ববোধ, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষিতকেই খুঁজে পাওয়া যায় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে। মুক্তিযুদ্ধের শরিক হয়ে কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রহমান। শামসুর রহমান লিখেছিলেন- 'বিষম পুড়েছে চতুর্দিকে ঘরবাড়ি।/ পুড়েছে টিয়ের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলী, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার / মানচিত্র, পুরোনো দলিলও / অদূরে গুলির শব্দ, রাস্তা চষে জঙ্গি জিপ। / আর্ত শব্দ সবখানে। তুমি বলেছিলে, 'আমায় বাঁচাও / অসহায় আমি

তা-ও বলতে পারিনি, তুমি বলেছিলে ।' আল মাহমুদ লিখেছেন- 'ধ্বংসস্তুপের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের খুঁজলাম । না, / চারিদিকে ইট আর লোহা ছাড়া কিছুই দেখছিনা / মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজ আমলের এই ভয়াবহ দালান / একটি নিঃস্তব্ধ কবরখানার মতো ছড়িয়ে পড়েছে । আমার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল । / (আমার সহবন্দিরা কোথায় ?)

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে বাংলাদেশের যে সব কবি কবিতা-চর্চায় ব্রতী ছিলেন তাঁরা হলেন - হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, বেলাল চৌধুরী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, দাউদ হায়দার, আবিদ আজাদ, শিয়াব সরকার, ত্রিদিব দস্তিদার, নাসির আহমেদ, হাসান হাফিজ, সাউফুল্লাহ, মাহমুদ দুলাল, অসীম সাহা, অরুনাভ সরকার, অরূপ তালুকদার, আব্দুল মোমেন, খালেদা এবিদ চৌধুরী, তিতাস চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, দিলীপ দে, দিলারা হাশেম, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, ফারুক আলমগীর, ময়ূখ চৌধুরী, মুর্তজা বশির, মোহন লাল বিশ্বাস, মারুফ রায়হান, মুদুল গুহ, শান্তা মারিয়া, শামীম আজাদ, শাহবুদ্দিন নাগরী, সাযযাদ কাদির প্রমুখ । এছাড়াও খোন্দকার আশরাফ হোসেন, অসীম সাহা, মুজিব ইরম, তসলীমা নাসরিন, আঞ্জুমান আরা, শামীম রেজা, নাজমুস সামস, মোস্তাক আহমেদ দীন, রাণা চট্টোপাধ্যায়, হাফিজ রসিদ খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক বাংলাদেশের কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে আরও একটি কারণে পৃথকভাবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে । এই সময়েই বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের কাব্যচর্চার ধারাটি ভিন্নপথ পরিক্রমা শুরু করে । সে প্রসঙ্গে যাবার আগে বলে নেওয়া ভাল, এই বিশেষ যুগটি ছিল অত্যন্ত টালমাটাল । আলোর উপাসনা সে সময় যতখানি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আলেয়ার উপাসনা । জীবন সে সময় কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছিল । ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল । বিজ্ঞাপনের শাসন সে সময় জীবনে স্ববিরোধিতার পথ ক্রম প্রশস্ত করছিল । শুরু হয়েছিল অসুস্থ প্রতিযোগিতা, আত্মদ্রোহ, হিংসা, অবক্ষয়, মনোগত বিচ্ছিন্নতাবোধ । মানব সভ্যতাকে ক্রমশ বর্বরতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল । এক ভয়াবহ না- পৃথিবীর সম্মুখীন হচ্ছিল বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ ।

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে বাংলার সমাজ ও সস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ নখদন্ত বিস্তার করেছিল । সভ্যতা- সংস্কৃতি বিরোধী, মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল । ইতিহাসকে পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা বৃদ্ধি পাচ্ছিল সে সময় । শ্রেণিশোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী কৃৎ কৌশলে ঢেকে রাখার জন্যে কূটাভাস ও অবভাসের জন্ম দেওয়া হচ্ছিল । চেতনা যদিও সে সময় পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, তখনই আবার স্থানে স্থানে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল । প্রতিচ্যাগত আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতার বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়ায় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে বাংলার মানুষ তার ঐতিহ্যের ভিত্তিমূল থেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল মিলন-দীপায়নের প্রেরণা ।

বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে বাংলায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দেখি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভুদের নির্দেশে যে সাহিত্য উৎপাদিত ও পণ্যায়িত হচ্ছিল, সেগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবভাস তৈরি করে চেতনাকে ক্রমশ আবিল, আবদ্ধ ও আছন্ন করে তুলছিল । এর প্রতিস্রোতে চলার প্রেরণা যে ছিল না তা নয় । এই প্রেরণার কিছুটা এসেছিল ঐতিহ্য থেকে, লোকজীবন থেকে পর্ব-পর্বান্তরে নেমে আসা নানা নেতিবাদী কর্মকান্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু-বাংলার কবিরা খন্ডকালের আলেয়ার বুকচিরে মহাকালের বক্ষে প্রজ্জ্বলিত আত্মদ্বীপের সলতে বাড়িয়ে দিতে লোকায়ত ঐতিহ্যের তৃণমূলে জেগে থাকা মানবিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন তাঁদের কবিতায় । এঁদের অনেকেই সেদিন চেয়েছিলেন সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার বিনির্মিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তার শক্তিকে পরিধি থেকে কেন্দ্রে নিয়ে আসতে, তাকে সংহত, সংগঠিত ও পুনর্নির্মিত করতে । এই সব কবিরা মানুষকে বিশ্বাস করতেন, মানুষের আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও মতামতকে শ্রদ্ধা করতেন বলেই মানুষের সাথে থেকে কাজ করে যেতে চেয়েছেন । কারণ তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে শিল্পের জন্যে শিল্প নয়, মানুষের জন্যেই শিল্প ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় নকশাল আন্দোলন কোনো ছাপ রেখেছে কিনা, এই প্রশ্নের আলোচনায় স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের সঙ্গে এই পরিচয় সাধন আমার কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় । এই যুগের বাংলা কবিতা নকশাল আন্দোলনের আগুন থেকে কোনো মহিমা লাভ করেছে কি না তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক । বিশ

শতকের অন্ত্যলগ্নে নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক হতাশা, মেকি রাজনীতিবিদ ও শাসকদের অরাজকতা, হিংসা, হত্যা, রক্তপাত, অপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম, বামপন্থী আন্দোলনের একাধিক নেতিবাচক দিক, বুর্জোয়া শোষণ-শাসনের শঠতা ও বঞ্চনা গোটা বাংলাদেশকে করে তুলেছিল বিভ্রান্ত ও অনিকেত (Rootless), অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলন ও দেশে শাসনের ক্ষেত্রে চরম বিফলতা মানুষের মনে, বিশেষ করে যুব সমাজে আশাভঙ্গের বেদনা জাগ্রত রেখেছিল। এসব কিছুই এ সময়ের কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছিল। সরকারি-বেসরকারি সন্ত্রাসের বিভীষিকা গোটা রাজ্যের মানুষের ন্যায্য কথা বলার স্বাধীনতা স্তব্ধ করে রেখেছিল। উচিৎ কথা বললেই চরম বিপদের সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টান্ত সে সময় ছিল অগুন্তি। হয় নীরবতা পালন অথবা জীবন থেকে পলায়ন— এই দুই প্রবণতাই সে সময়ের কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, সমাজে মুক্ত পরিবেশ থাকলে কবিও সেই পরিবেশে সমাজ জীবনের সত্যরূপ তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু যদি বিপরীত হয় অর্থাৎ সমাজে যদি একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশ বিরাজ করে তখন কবিরা ফুল-চাঁদ-তারা অথবা ভাবালু-প্রেমের কবিতা রচনা করে নিরাপদ দূরত্বে নিজের অবস্থান সুরক্ষিত রাখেন। অথবা এমনও হওয়া বিচিত্র নয়, কোনো জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে গিয়ে তাঁরা মদিরা সেবন করে জ্যোৎস্না ভরা রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করে কবিতা রচনা করেন বটে, কিন্তু সেই গাঁয়ের দুঃখ-দৈন্য, মারী-মড়ক, বন্যা-পীড়ন, কন্যাপীড়ন, দারিদ্র-বুভুক্ষা, সংস্থানহীনতা — এসব তাঁদের কবিতায় প্রকাশ পাবেনা। আবার গায়ের কোনো তরুণ কবির কবিতায় যদি শুধু গ্রাম ভিত্তিক রোমান্সই প্রকাশ পায়, দুঃখ-দৈন্যের প্রকাশ না ঘটে তাহলে তা কাব্য-বিলাস-এ পরিণত হয়। কবির এই আত্মরতি আত্মবিলাসের নামান্তর। কবিতায় সেখানে জীবন-দ্বন্দ্ব অথবা সমাজ-সংঘাত চেতনার প্রকাশ ঘটে না। এই মূল্যবোধ ও আশা-হন্তারক যুগে জীবন হয়ে উঠেছিল ছিন্নমূল, মানুষ হয়ে পড়েছিল দিশেহারা, অসহায়। বিশৃঙ্খলা , ভাঙার উন্মাদনা, নৈতিক অবক্ষয়, নীতিবোধের অপসারণ, হতাশা ও অবিশ্বাস মানুষকে দাঁড় করিয়েছিল এক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। ভরসা করার মতো অবলম্বন কোথাও ছিলনা বললেই হয়। মানবিক বিশ্বাস ও কল্যাণবোধের ধারণাকে বিদায় নিতে

হয়েছিল সমাজজীবন থেকে। বাংলা কাব্য সাহিত্যেও জয়গা দখল করেছিল সেই বেদনা, অনিশ্চয়তা ও বৈপরীত্য ভারাক্রান্ত মন। এই সামগ্রিক অবক্ষয়ের যুগে নবরূপে যুগকে প্রকাশ করতে ভঙ্গিপ্রধান হয়ে উঠলেন কবিরা। সেই সঙ্গে যুক্ত হল বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব। ফলে বাংলা সাহিত্যের জটিলতা ও দীপ্তি বিচ্ছুরিত হল নতুন দিগন্ত নিয়ে। এই পরিবর্তমান যুগের পটভূমিকায় কবিদের মূল্যায়ন করতে প্রয়াস পাব।

সময়, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে যদি স্বীকার করি তাহলে এ-ও স্বীকার করব, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজ বাস্তবতা, বিশ্বায়নের ধনতান্ত্রিক কৃৎ-কৌশল ও যুক্তি-শৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক, রাজনীতির অন্ধবলয়ও ছিল পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে ইতিবাচক মুক্তনির্মিতির দিকে নিয়ে যাওয়াই কবির দায়। কারণ সব ধরণের বিভাজন, হিংসা-দ্বেষ, ধর্মীয় কুসংস্কার, অনুশাসনের অত্যাচার, কুপমন্ডকতা, সত্যভ্রম ও অবভাস অর্থাৎ এক কথায় খন্ড সময়ের নেতিবাচক বাস্তব পরিস্থিতি কবির কাছে কখনোই কাম্য হতে পারে না। জলোচ্ছ্বাস যেমন জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত, তেমন খন্ড সময়ের বুদ্বুদও মহাসমুদ্ররূপ সময়েরই স্বরূপ। এতে সব সময়েই পুরাতনের হৃদয় টুটে নব নব নির্মিতি সম্ভব হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের শেষপাদে বিশ্বায়ন যে ইতিহাসের অবসান ঘোষণা করেছিল তা পুরোপুরি মুক্তিবিরোধী। কিন্তু যেহেতু শেষ কথা বলে কিছু নেই, অতএব মুক্ত সময় ও পরিসরের দিকে ক্রমাগত যাওয়াটাই ইতিহাসকে সচল রাখে। এই চলমানতার অন্তর্নাট্যে ভাবাদর্শ ও মূলবোধগত অবস্থানই ছিল সে সময়ের কবিদের দায়। যাঁরা সেই 'সময়ের দায়ভার' গ্রহণ করেন নি, তাঁদের নাম বাংলা কাব্যসাহিত্য থেকে মুছে গেছে। কারণ, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জনীয় সেটি সে ঠিকই চিনে নেয়।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে পালা বদলের সময় হিসেবেই চিহ্নিত। বলাবাহুল্য, এই পালাবদল স্বদেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। সে সময় দিনগুলো ঢাকা ছিল চরম বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী অন্ধকারে। এই অন্ধকারই সেদিন বহু তরুণ-তরুণীর কাছে সার্বভৌম ও অবিকল্প হয়ে উঠেছিল। দান্তের নরকের চেয়েও

'নাস্তির তিমির' সে সময় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল অনেকের কাছেই। তবে এরই মধ্যে মেধার অনুশীলন বা চর্চার বহিঃপ্রকাশে শিল্পেরও যে পুনর্নির্মাণ ঘটেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কবিতা চর্চার মধ্যে সমকালকে চিহ্নিত করেছে কিছু কবিতা। এই কবিত চর্চার মধ্যে কবির অবিষ্কার যে আমাদের সচকিত করেনি তা নয়। এই সময়ের কবিতায় আমরা উপলব্ধি করেছি কবিতার নির্মাণ-কৌশলে শব্দ ও ধ্বনির বিচিত্র আবহ। এই আবহ সে সময়ের চারপাশের শব্দবাহিত আমাদের ব্যবহৃত বস্তু সামগ্রীর। শব্দ এবং ধ্বনিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল আশ্চর্য চিত্রকল্প। এ নিঃসন্দেহে আধুনিক কবিমনস্কতার লক্ষণ। সমকালের যন্ত্রণা, দুঃখ এবং আনন্দকে শব্দ দিয়ে চিত্রিত করে কবিরা সে সময় আধুনিক মননকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এমন একাধিক কবিকে আমরা বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে পেয়েছি যাঁরা শব্দ ও ধ্বনির কলা-কৌশলে সমসাময়িক সময় প্রবাহ বা তার বিবর্তনকে পাঠকের সাথে 'কম্যুনিকেট' করতে পেরেছেন। কবিতার ভাষা সাবলীল স্রোতের মতো যে হৃদয়েও গতি সঞ্চার করতে পারে সে সত্যের প্রমাণ পাই আলোচ্য সময়ের অনেক কবিদের মধ্যে। এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি, অনুশীলন-চর্চার মধ্যে কিছু মননশীল কবি কবিতার প্রযুক্তিতে সে সময় অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু জীবন প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল না। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে হয়, বহির্জগতের পরিবর্তন মনোজগতকে আলোড়িত করেনি তেমন ভাবে। কারণ এই বস্তু-জাগতিক পরিবর্তনের কোনো নিগূঢ় উৎস নেই, অর্থাৎ সভ্যতার বিকাশের সাথে এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতা নেই। যার ফলে মানুষ একে নিতান্ত চমক বা অভিনব কৌশল হিসাবে অনুধাবন করছে। ফলশ্রুতি, কবিতায় এই সময়ের প্রতিফলন ঘটছে না। দ্বিতীয়ত, এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে কবির মনোজগতের পরিবর্তন সমান্তরাল নয়। প্রযুক্তির অভিনব প্রয়োগ কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। নান্দনিক চিন্তা এই সময়কে ধরতে পারছে না।'[৪]

সত্যিই, এই দ্রুত ধাবমান ও পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে বস্তুজগৎ যেভাবে বিশ শতকের শেষের দশকগুলোতে আবর্তিত হচ্ছিল, কবির সাথে তার মেলবন্ধন ঘটছিল না

বললেই হয় । তবুও আশার কথা এই যে সময়ের সঞ্চরণশীল জীবন-স্পন্দন অনুধাবন করার জন্য শব্দ ও ধ্বনির বিন্যাস সে সময়ে একেবারে বিফলে যায়নি । ফলে যুগ যতই অসহনীয় হোক না কেন, মেঘ-বৃষ্টি-রোদের প্রার্থনাও সেসময় ছিল অব্যাহত, সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্যেও ভালবাসা কবিমন ও লোকমনকে নতুন সত্যের দিকে পৌঁছে দেবার ইঙ্গিত দিচ্ছিল ।

[২]

সময়কে যদি দেখাতে হয় কোনো প্রতীকী চেহারায়, পরিবর্তনে তবে বলতে হয়, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের, বাংলা কবিতা আগের যুগের কবিতা থেকে একাধিক অর্থে ভিন্ন । এ সময়ের কবিতা দীর্ণ হয়েছে প্রশ্নে, প্রতিবাদে, সংগ্রাম-ভাবনায়, নৈরাশ্যবোধে, সংশয়ে, প্রেমে ও অপ্রেমে । এক বিশেষ কালজ চরিত্র ও মেজাজ নিয়ে এ যুগের কবিরা স্মৃতি, আশা, মূল্যবোধকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন গভীরতর প্রয়োজনের প্রশ্নে । যদিও এ সময়ের কবিতা স্পষ্টতই আধুনিক কাব্যরীতির সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, তবুও তাকে শুধু যুগের সাধারণ পরিবর্তনের সূত্রে ব্যাখ্যা করা যাবে না । সময়-চেতনা বহুমাত্রিক করে তুলেছে তার সত্তা-জিজ্ঞাসাকে, যার মধ্যে সার্থক ভাবে বৃত হতে পেরেছে প্রতিবাদী বিশ্ব, এসেছে বিশৃঙ্খলতার নানা প্রতীক । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক এক স্বতন্ত্র সময় বলেই বাংলা কবিতাকে সে দিতে পেরেছে এক প্রসারিত পটভূমি । ফলে স্বভাবতই চিত্রকল্প, ভাষা-প্রয়োগ, শব্দ ও ধ্বনি-ব্যবহার এবং প্রতীক রচনায় এ কালের বাংলা কবিতা অনেক বেশি ইঙ্গিতময়, চিন্তা-নির্ভর, বক্তব্য প্রধান ও সামগ্রিকভাবে সমকালিক চেতনার স্পন্দিত । বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত ও বহির্ভারতে নানা সংঘর্ষ- নাগা বিদ্রোহ, চিন আক্রমণ, এশিয়া ও আফ্রিকার রক্তাক্ত সংঘর্ষ, বর্ণবিদ্বেষ, দাঙ্গা, পাক-ভারত যুদ্ধ, ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, আলজেরিয়ার সংঘাত এবং দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারি, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্পর্শ করেছিল অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতাকে । দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংঘাত-সংকট ও সমস্যার বুক-মোচড়ানো ব্যথা থেকে সে সময় জন্ম নিয়েছিল অসংখ্য বাংলা

কবিতা। তবে সব কবিই কিন্তু সম-মানসিকতার শরিক হতে পারেননি চিন্তায়,মেজাজে, শব্দ ব্যবহারে, চিত্রকল্প অথবা প্রতীক নির্মাণে, জীবনবোধের গভীরতায় কিংবা প্রেম, প্রকৃতি, সময়, সমাজ, সত্তা ও আত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে। কবি মানসে যে বিচিত্র অনুভূতিমালা গড়ে উঠেছিল প্রত্যাশায়, আকাঙ্খায়, পরিহাসে, প্রত্যাখানে, আসক্তিতে, বীতস্পৃহায়, তার চিত্র-বৈচিত্র্যও আবেগ মূল্যের অনেকখানিই লোকানুপ্রেরণার অভিব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছিল।

আরও একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। বিংশ শতকের ষাটের দশকের কবিতার ভাষার প্রতীক ধর্মিতা সত্তরের দশকের পর থেকে অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষতা ও বিবৃতি ধর্মিতার দিকে ঝোঁক বেড়েছিল। কবিতার পাঠক সংখ্যাও যেমন বেড়েছিল, তেমনি অজস্র পত্র-পত্রিকা আর সংবাদ মাধ্যম পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগকে অনেক বেশি সহজ করে তুলেছিল। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সাত দশকের প্রথম দু'তিন বছর পশ্চিম বাংলার রাজনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রভাব ফেলেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন পশ্চিম বাংলায় না হলেও সমকালে এই আন্দোলনের ফলে কিছু কিছু মনোভঙ্গি মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল যার জের সহজে মুছে যায় নি। প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী বড় দলগুলির প্রতি মানুষের কিছুটা মোহভঙ্গ হয়েছিল এই আন্দোলনে। অল্প সময়ের জন্য হলেও অঞ্চল বিশেষে জোতদারদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল ভীতির। খানিকটা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন আদিবাসী ও দরিদ্র কৃষকেরা। আর সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলন দমনে পুলিশি নিষ্ঠুরতার প্রয়োগ সাধারণ মানুষকে খুবই বিচলিত করেছিল। প্রতিবাদী কবিতার এবং সুস্পষ্ট সমাজ সচেতন কবিতার যে ধারাটি বিংশ শতকের চারের দশকের পর ততটা প্রবল ছিল না, নতুন করে তার জোয়ার দেখা দিল সাতের দশকে। ভিন্ন শিবিরকেও তা প্রভাবিত করে কিছুটা। পাঁচের দশকের কোনো কোনো কবি এই সময়ে সমাজ-মনস্ক কবিতা লিখেছেন অনেক বেশি। মধ্যপন্থী কবিরা হয়ে উঠেছিলেন কিছুটা বেশি প্রতিবাদী। আবার কেউ কেউ একটু জোর করে ব্যক্তিগত ও সমাজ-উদাসীন কবিতার ধারাই আঁকড়ে ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সাত দশকীয় বাংলা কবিতার চেহারাটি বেশ মিশ্রিত।

আটের দশকে বাংলা সাহিত্যে সমাজ মনস্ক কবিতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সব মনোভঙ্গির কবিরাই কিছুটা সমাজ-সজাগ হয়ে উঠেছেন আবার। নতুন একদল তরুণ কবি তাঁদের কবিতায় সমাজের নানাবিধ চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন দেবব্রত ঘোষ, মিহির মুখোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি সিংহ, সুমন মিশ্র, কিরণ শংকর মৈত্র, অমরেন্দ্র গনাই , নির্মলেন্দু দাস, মণি মুখোপাধ্যায়, সুধীর রঞ্জন ঘোষ, স্বপন নন্দী, আবিদুর রহমান, শৈলেন ঘোষ, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব চন্দ, প্রণব মাইতি, অঞ্জন সেন, অমিত চক্রবর্তী, শিবেন মজুমদার, জয়ন্ত চৌধুরী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চক্রবর্তী, নীতিশ চৌধুরী, নীরদ রায়, তপন কর, জীবনময় দত্ত, উদয়ন ভট্টাচার্য, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভ দাসগুপ্ত, রণজিৎ মজুমদার, নির্মলেন্দু বিশ্বাস, গৌতম চৌধুরী, তুষার আদক, সন্তোষ কুমার মাজী, অসীম চক্রবর্তী, সুনীল দাস, সুনীল গুপ্ত, মানব চক্রবর্তী, যোগব্রত চক্রবর্তী, নিমাই দাস, দাউদ হায়দর, বঙ্কিম চক্রবর্তী, প্রবীর রায়, চিত্ত ভট্টাচার্য, অরুণ বাগচী, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, জিয়াদ আলি, অনন্ত সাহা, সন্তোষ দে, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ রায়, সমীর দে, ফিরোজ চৌধুরী প্রমুখ। এইসব তরুণ কবিদের কবিতায় সমাজ ব্যবস্থার ছায়াপাত ঘটেছে বেশি। এর কারণ, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে নানা ধরণের সংবাদ মাধ্যমের বিস্তার দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষর মানুষকে খুব বেশি অবহিত রাখতে পেরেছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলনও বেশ খানিকটা বিস্তার ঘটিয়েছিল সমাজ চেতনার। এই সময়ের মধ্যে শুধু এপার বাংলায় নয়, ওপার বাংলায়ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের তরুণ-তরুণীরা কবিতা ও পত্র-পত্রিকার জগতের কিছুটা কাছাকাছি চলে আসতে পেরেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে বলা যায়, সেই সময়ে, অর্থাৎ অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে বাংলা কবিতা পুরোপুরি কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল না। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গের নানা শহরের ছোট ছোট পত্রিকায় কলকাতার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই প্রকাশিত হচ্ছিল নানা ধরণের কবিতা। এইসব কবিতায় প্রকাশ ঘটেছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অঞ্চলিক পরিস্থিতির। বাংলা কবিতায় এই সমাজ ভাবনার প্রকাশ প্রায় সম্পূর্ণতই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি। তার ফলে প্রাক-অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কয়েকটি ইতিবাচক

পরিবর্তনের দিক হয়ত তেমন ভাবে উঠে আসেনি বাংলা কবিতায় । 'যেমন, গৃহপরিচারক-বৃত্তিতে নিয়োজিত অসংগঠিত শ্রমিকেরা তাদের হীনমন্যতা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন ক্রমশ । কোথাও সংঘবদ্ধ হচ্ছেন । অন্তত দাবি ও অভিযোগের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছেন । গ্রামীন কৃষক আজ নগর অঞ্চলেও যথেষ্ট সামাজিক সম্মানে প্রতিষ্ঠিত । এক প্রজন্ম আগেও ঠিক এরকম ছিল না । বৈদ্যুতীকরণ, সেচব্যবস্থা, ভূমি বন্টন ইত্যাদির ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষের কিছু সচেতনতা জেগেছে । যাঁদের নেই তাঁরা চাইতে শিখেছেন । শোষিত মানুষ কখনো ভাবছেন যে প্রতিবাদ সম্ভব । ঈশ্বরের পরিবর্তে তাঁরা যে সরকারকে দায়ী করার কথা ভাবছেন- এটাই একটা গভীর পরিবর্তন । অন্যদিকে সবরকম বিপণনের ক্ষেত্রে মিড্‌লম্যানদের উপস্থিতি, রাজনীতির পর্দা আবৃত লুণ্ঠনকারীদের ব্যাপক বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অসহযোগ ও অবনতি, বহুঅঞ্চলে এক ধরণের সন্ত্রাসের রাজত্ব, রাজনীতি-ব্যবসায়ী সুবিধাবাদীদের প্রভাব বিস্তার- এই পরিস্থিতির সবটাই কবিতায় ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়নি ।'[৫] সময়ের এই স্বর থেকে স্বরান্তরের বিশ্লেষণ পদ্ধতি কবিতার ক্ষেত্রে হওয়া কঠিন । কারণ, কবিতার প্রধান আঙ্গিক বিবরণ-পদ্ধতি নয়, তার মূল করণ-কৌশল হল উপলব্ধির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ । তবু একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে সমাজ চেতনার ঐকান্তিক প্রত্যক্ষতায় রচিত কবিতার সৌন্দর্যের প্রতি অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের পাঠক-পাঠিকা আর সংশয়ী ছিলেন না । এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানামুখী কবিতার স্বাধিকারের দাবি ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক ইতিহাসও বদলে যাচ্ছিল পরিবর্তনশীলতার স্বাভাবিক ধারায় ।'৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও জনমানসে নানা ধরণের চাপ, যেমন-ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন, মার্কসবাদের প্রসার, সমাজ পরিস্থিতিতে পুরোনো নৈতিক আদর্শের ভাঙন অব্যাহত ছিল । এই উল্লেখযোগ্য কারণ গুলোর সাথে পাশ্চাত্য ভাবনা ও বিজ্ঞান চেতনার বিশ্বব্যাপী প্রসার ও বিবর্তন দু'বাংলার কবিতা-চর্চার সূত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যাবলীও কবিতার চরিত্র-বিবর্তনের কারণ হয়েছিল । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের যুগ-চালচিত্রকে তাই আলাদা করে দেখতে হয় । 'ঐক্য সমগ্রতার'

বিষয়টি মনে রেখেও অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিদের সোৎসাহ সক্রিয়তা বিশেষ বীক্ষণের বিষয় । কারণ, বাংলা কাব্য ইতিহাসের এই বিশেষ টুকরোটি বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ ।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় যে মঙ্গল বিধায়ক ঈশ্বরের কথা পাই এবং যে সামাজিক বিন্যাসে সেই বিধানের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য লক্ষ করি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সেই ঈশ্বর বিষয়ক ইতিবাচক ভাবনায় ভাঙন দেখা দেয় এবং এই শতকের অন্ত্যলগ্নে বিজ্ঞানের বিস্ফোরক আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনশীলতায় ঈশ্বর শক্তিতে মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার পারদ ক্রমশ নিচে নামতে থাকে । সময়ের এই স্বরান্তরের প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও আবিষ্কার সমূহের ফলে মানব জাতির বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সময়ের গতি, পরমানু ও প্রাণোৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের মনে সব ভাবনার জড়বাদী ব্যাখ্যায় আস্থা দেখা দিল । যেখানে ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না সেখানেও ক্রম অর্জিত বিশেষ মানবিক জ্ঞানের ফলেই তা পাওয়া যাবে একদিন - এই ধারণা মানুষের মনে গভীর হতে লাগল । সর্ব অর্থেই ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন এক সভ্যতা গড়ে উঠতে লাগল । এই মানসিককতার পরিপোষক হিশেবে দেখা দিল সামন্ত তন্ত্রের বিলোপ সাধন করে আবির্ভূত হওয়া ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণা ।'[৬]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় তাই পরলোকে স্বর্গ লাভ প্রাপ্তির কথার পরিবর্তে ইহচেতনা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃতি পেল এবং লোক জীবনের আটপৌরে প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি কবিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল । লোকোত্তর অস্তিত্বের প্রতি আস্থাহীনতার বিপ্রতীপে ইহচেতনার বাতাবরণকে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা নাড়ি-নক্ষত্র সহ কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন । যেখানে শব্দের বিশাল মানচিত্রটি শুধু পরিমাণ জ্ঞাপক হয়ে থাকেনি, উৎকর্ষজ্ঞাপকও হয়েছে । কবিদের ব্যবহৃত সেই অসংখ্য শব্দ-শৈলীর প্রসঙ্গ রয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে ।

সময় নিরবধি হলেও তাকে আমরা দশক-শতকের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসি ঘটনা বিন্যাসের প্রয়োজনে । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে দু'বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিন্যাসের রদ-বদল হয়েছিল ত্বরান্বিত । সেই সব দৃশ্যান্তরের চিত্রমালা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে

রয়েছে কবিদের কাব্যে । ইতিহাসের নিয়মে যে পালাবদলের হাওয়া চারদিক থেকে বইতে শুরু করেছিল, তখনকার কবিরা তাঁদের মানস-বলয়ে ধারণ করেছিলেন সেই ঋতু পরিবর্তনের ভগ্নাংশকে, যার মধ্যে ছিল আত্মবিশ্বাসের তৃষ্ণা ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের নানা উত্তেজক ঘটনার বেড়াজালে বন্দী হয়েছিল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন । বলা বাহুল্য, কবির শক্তি ও সাহসও বন্দী হয়েছিল সেই উত্তেজনায় । সে সময়ের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার ধাত পরিবর্তন করেনি শুধু, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে ও জীবনদর্শনে নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল । সেই সময়ের কবিরা 'আত্মোৎপন্ন' হয়েও ছিলেন বঞ্চিত সমাজের মানুষ । এই বিশেষ সময়ের স্বর ও স্বরান্তরে ছিল বিষাদচারিতা - যা থেকে কবিরা খুব দূরে ছিলেন না । আবার এই সময়েই শুধু ইংরেজি ও ফারসি কবিতা নয়, কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠের আগ্রহও তরুণ বাঙালি কবির জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করেছিল । সময়ের স্বরে সেদিন যে জনগণতান্ত্রিক চেতনা ছিল তা কখনো কাব্যরসে জারিত হয়েছিল দুঃখাত্মক বিষাদ চেতনায়, কখনো প্রেমের মনস্তাত্ত্বিকতায়, কখনো বা যৌবন সংলগ্নতায় । আবার এসবের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছিল লৌকিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে লোকায়ত মানসের অফুরান আশা-আকাঙ্খার সুর । বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাংলার অনেক কবিই সে সময় বাইরের দিক ছেড়ে ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিছেলেন —

আমার ভারতবর্ষ কোটি নগ্ন মানুষের ।
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারারাত
ঘুমুতে পারেনা
সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে
চারদিকের প্রচন্ড মারের মধ্যে
আজো ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর ।

(আমার ভারতবর্ষ / বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সময়ের স্বর ও স্বরান্তরে কবিদের মেজাজের তারতম্য ঘটে যায়- কবিদের অনেকেই স্ববিরোধিতার শিকার হন । কিন্তু সবকিছুই তো ঘটে কবির স্বীয় মর্জি মাফিক ।

ইষ্ট দেবতা বা রাজা কেউ-ই তো কবিকে বাধ্য করেন না অন্তরের ভাবকে বহুবর্ণে বিচ্ছুরিত করে প্রকাশ করতে। এই কবিতাই বহুদূর অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসে, বর্তমানকে আবার বহুদূর ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যায়। তাই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতা ঠিক যেন এক মজবুত সাঁকো- যার ওপর দিয়ে এ-যুগের পাঠকমন চলে যায় দূর অতীতে। তাঁরা অতীত আর বর্তমানের সংযোগ সেতু নির্মাণ করে আমাদের পারের কর্তা হয়ে আছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই বিশেষ সময়ের কবিরা বড় বেশি সামাজিক মানুষ বলেই সমাজের অন্তর্দাহ তাঁদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাঁদের মধ্যে জমে ওঠে সংগ্রামের বেদনা। কবি রাসবিহারী দত্ত যতগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন-'কুরুক্ষেত্র কি কলকাতায়' (১৯৭৬), 'যুদ্ধে আছি কবি' (১৯৭৮), 'যুদ্ধ ক্ষেত্রে কালবেলা' (১৯৮১) 'দায়বদ্ধ' (১৯৮১)- সেগুলির সবকটিতেই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বিশেষ রক্ত ঝরা দিনগুলি কাব্য-বিষয়ের পটভূমি রচনা করেছে। যে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার জন্য এপার বাংলায় বিক্ষোভ, বিদ্রোহ আর বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই বিপন্ন সময়ের কবি রাসবিহারী দত্ত ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থাকে কেন্দ্র করে লেখেন -

রাশ টেনেছো বড়ই চতুর ইমারজেন্সি ইমারজেন্সি
নীলকণ্ঠ ফুঁসছে রোষে রাশই তোমার হচ্ছে রশি।

(কাব্য ঃ কুরুক্ষেত্র কি কলকাতায়)

১৯৯৯ সালে 'পাতাদের কবিতা'য় কবি ভূদেব কর ১৯৭৬-এর কালবেলা নিয়ে লিখেছিলেন -

প্রতিবার একই রকম পাতা একই নিয়মে
একই হিসেবে একই সময়ে ঝরে যায়
আমি বিশ্বাস করিনা।
আমি জানি উনিশশো ছিয়াত্তরে ঝরে যাওয়া শালপাতা
উনিশশো নিরানব্বইয়ে ঝরে যাওয়া শালপাতার চেয়ে আলাদা।

(পাতাদের কবিতা / দেশ, ৭ আগস্ট, ১৯৯৯/পৃ-৬১)

কবি গত তেইশ বছর (১৯৭৬-১৯৯৯) ধরে দেখেছেন, একই গাছের নিচে প্রতিটি পাতা

আলাদা আলাদা হয়ে আলাদা রকমে ঝরে যাচ্ছে- 'আমাকে দেখলেই টের পাওয়া যায় / প্রতিটি আলাদা পাতা আলাদা হয়ে ঝরে যাচ্ছে পাগল হাওয়ায়' । 'সত্তরের সেই দিনগুলিতে দিকে দিকে মৃত্যুর ষড়যন্ত্র, ভ্রাতৃঘাত, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, শঠতা, ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা বাংলাকে করে তুলেছিল বিভীষিকাময় মৃত্যু উপত্যকা । নিতান্ত ঘৃণা আর ক্রোধের সমমেল এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কবিদেরও কতোটা প্রভাবিত করেছিল তার বহু শ্রদ্ধেয় দৃষ্টান্ত ইতিহাস হয়ে আছে। সময়ের এই তামসিকতা সরোজ দত্তের মতো কবিকে গ্রাস করেছিল, আমরা জানি ।'[৭] ১৯৮৪-তেও নিজের দেশের বুকে দাঁড়িয়ে লজ্জা ও রাগে চিৎকার করে উঠতে হয়েছে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে, 'আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি উনিশশো চুরাশিতে ?' সমসাময়িক কালের নানা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধার্মিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে, দ্বিধাহীনভাবে শত-সহস্র নিঃশব্দ প্রতিবাদকারীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি উচ্চারণ করেছেন -

যে হিন্দু স্বার্থপরের মতো রোজ পুজো আর্চায় মাতে,
যে মুসলমান পারিপার্শ্বিকের প্রতি চোখ বন্ধ করে রোজ
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে
যে খ্রিস্টান অন্য ধর্মের মানুষদের অধঃপতিত মনে করে
যে শিখ শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়
তারা শুধু আত্ম প্রবঞ্চক নয়, তারা অধার্মিক, তারা খুনি
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশুহত্যার জন্য দায়ী ।

কবির কাব্যে উপস্থাপিত এই যে সমসাময়িকতা তাতে রয়েছে অত্যন্ত সচেতন প্রতিবাদী স্বর । এই প্রতিবাদ কবিকে নিয়ে যায় সময় থেকে সময়ান্তরে । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের শেষে এসে অন্যান্য অনেক কবির মতো সুনীলও অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আমি মার্কসবাদের মূলতত্ত্বে বিশ্বাস করি । তবে আমাদের দেশের এগারোটি বা তারও বেশি পরস্পর বিরোধী মার্কসবাদী দলের বিশ্বাস বুঝি না । শুধু গরীবের জয়গান আর বড়লোক গুলোকে লম্পট ও খল দেখিয়ে একঘেয়ে রচনা লিখে গেলেই দেশের কোনো উপকার হবে, এমন আমার কখনো মনে হয়না । ধর্মীয় কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা এমন কি

ভূতের ভয় ইত্যাদি দূর করার কাজেও আমাদের সাহিত্যের যদি কিছুটা প্রভাব পড়ে তাহলে তাকেও আমাদের মতন দেশে সমাজ পরিবর্তনের অনেকখানি কাজ হয় বলে আমার বিশ্বাস । যার পরমত সহিষ্ণুতা নেই, মানুষের রক্তস্রোত দেখেও যে নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে আঁকড়ে থাকতে চায় তাকে কিছুতেই ধার্মিক বলা যায় না । অপরপক্ষে কোনো ধর্মে বিশ্বাস নেই, এমন মানুষ মানবতার বিশ্বাসী হতে পারে, হিংসাকে ঘৃনা করতে পারে, সৎ থাকতে পারে, অন্যের দুঃখ-কষ্টে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে ।..... একটি যুদ্ধেই বিপন্ন হয় গরীব মানুষ, সাধারণ মানুষ । প্রতিটি যুদ্ধই আরও অভাব, আরও দারিদ্র সৃষ্টি করে, পিছিয়ে দেয় সভ্যতা ।'

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'আমরা বন্দী ধর্মের নামে অধর্মে ।' / বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা ঃ সম্পাদনা-সুবল সামন্ত / পৃষ্ঠা ২২২ থেকে সংগৃহীত ।)

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এপার বাংলা প্রসঙ্গে অশ্রু বসু 'সত্তর দশকের অগ্নি কিরণে গণতন্ত্রের রমরমা বাজার' কবিতায় লিখেছেন -

ধূর্ত শেয়ালের মতো লোডশেডিং
নিস্তব্দ রাত্রিতে সভ্যতার নির্মম রক্ত
ব্যস্ত ঢেউ ক্রোধের ভালবাসার
কাশফুলের স্পর্শ,
আর শিরায় শিরায় ক্রোধ
এসব এখন সাজানো সমাজে
সাজানো ঘরের আসবাবপত্র ।
সত্তর দশকের অগ্নি কিরণে
পোড় খাওয়া মানুষ অস্তিত্ব নিয়ে চলে
কেউবা, কেউ সেসব নিয়ে বড় রমরমা
বাজার খুলেছে গণতন্ত্রের বুকে ।
আশ্চর্য সম্পদ .....
মরুভূমিকে শষ্য শ্যামলা করা কঠিন

নিজের অস্তিত্বের কাছে নিজেই হেরে যাওয়া
সেনা এরা ।

কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের ভাষায় -

সত্তর-একাত্তরের যুবমেধের
দুকূল ওপচানো স্মৃতি ।
আমরা এখন
বিশাল দুঃখেও ভেঙে পড়িনা,
বিপুল উল্লাসেও গলা মেলাই না আর
খুব হিসেব করে
পা টিপে টিপে চলতে হয় আমাদের ।[৮]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক আজ ইতিহাস । সেই ইতিহাস, যা স্হির এবং কঠিন ; যার

'অকম্পিত কৃপাণ শোভিত বজ্রহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর-
ক্ষমা জোগায় না তার নির্দেশ ।
তিথিতে আর তিথির বাইরে তার মহাশ্বেত
ঘোষণা লিপির শমন পৌঁছোয় দ্বারে দ্বারে-
অকৃপণ তার কণ্ঠ ।
সতত তরুণ যাত্রা
বিদ্রোহী নবকেতন কুয়াশা লীন
পথের প্রস্তুতি স্থির করে -
'জীবনের দ্বার সংক্রীর্ণ এবং দুর্গম
অল্প লোকেই তা পায় ।'[৯]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক দশক পরে ওপার বাংলায় শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ । বাংলাদেশের ইতিহাসে ভয়াবহতম বিনষ্টির ও নৃশংসতম গণ হত্যার দশমাস বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিল । হাজার হাজার গ্রাম আধুনিক সমর প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুহূর্তে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল । আনুমানিক ত্রিশ লক্ষাধিক পুরুষ ও নারী আহত

ও নিহত হয়েছিলেন। ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় এক কোটি ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মনুষ্যত্বের এমন ব্যাপক অবমাননা, নির্যাতন ও সন্ত্রাস বাংলাদেশে কেউ আগে দেখেনি। এর সবই যে বিজাতীয়, বহিরাগত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল তা নয়। 'আলবদর, আলসামস, রাজাকার প্রভৃতি নামে সেনাবাহিনীর সহযোগী সন্ত্রাসী গড়ে তোলা হয়েছিল স্থানীয় ইসলাম ধর্মানুসৃত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নিয়ে তাদের নামকরণে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কার ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িত আলবদর, রাজাকার প্রভৃতি অভিধা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার হয়েছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করে বৈধতা আদায় করার জন্য।'[১০]

কিন্তু গণমৃত্যুর আতঙ্ক বেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায় নি। স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রাণিত জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদেরই গোপনে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে আগাগোড়া। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে তাদের প্রাণাধিক সন্তানদের। প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় প্রকল্প বর্বরোচিত শক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও পরাভূত হলো গণ হত্যাকারীরা। 'পরাভূত হলো এবং আত্মগোপন ও সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করলো বটে, কিন্তু নিশ্চেষ্ট হলো না। তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু সহ তাঁর পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধের চার নেতার হত্যা এবং পরবর্তী পর্যায়ে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন আপতিক হতে পারে না '।[১১] এই মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস ও গুপ্তহত্যার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ। এদেরই বিরুদ্ধে, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, জনগণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর মূল কারণ সমাজ চেতনা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের অনেক কবির মানসভূমি তৈরি হয়েছিল'৭১-এর আন্দোলনের সংঘাত ও সংগ্রামশীল সমাজ পটভূমিতে। ওপার বাংলার স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতি সত্তার চরম পরীক্ষা। বলা বাহুল্য, সৃষ্টিশীল চৈতন্যেও এই পরীক্ষার মূল্য অপরিসীম। বাংলাদেশের অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতায় তার প্রমাণ সুপ্রত্যক্ষ। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অনেকের চেতনাও হয়ে উঠেছিল

ইতিবাচক জীবন জিজ্ঞাসায় বিবিক্ত । তাঁরা জীবনের সদর্থক প্রান্তগুলোকে সজ্ঞানে পরিহার করতে চাননি । আবার অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে ওপার বাংলায় এমন কবিও ছিলেন যাঁরা জীবনের নেতিবাচক রূপের প্রকাশকে অব্যাহত রেখেছিলেন । তাঁদের কবিতায় তাঁরা পরাভব চেতনাকে শিল্পিত করেছিলেন । এসময়ের অনেক কবি আবার উচ্চকণ্ঠ রাজনীতিলগ্ন বক্তব্যকে কবিতার শিল্প-যাত্রায় সামিল করেছেন । রাজনীতির সঙ্গে শিল্পের মিলন সেতু রচনা যে অসম্ভব নয় তা প্রমাণ করেছেন আবু করিম, আব হাসান,শিহাব সরকার, নাসির আহমেদ, আবিদ আনোয়ার, আহমদ রফিক প্রমুখ কবিরা । এঁদের মধ্যে আবুহাসান শাহরিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁর কবিতা শিল্পের সকল শর্ত পুরণ করেই প্রথা ভঙ্গের ঘোষণা দেয় । তাঁর কাব্য দর্শনের মূলে রয়েছে মাটি ও ঐতিহ্য । প্রকাশ আঙ্গিকে তিনি পরিশীলিত অথচ আধুনিক । কবিতায় তিনি তাঁর নিজস্ব একটি ভাষা দাঁড় করিয়েছেন ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে বাংলাদেশের কবিতায় যে এক ঝাঁক নবীন কবি আবির্ভূত হলেন তাঁদের মধ্যে পাই দ্বিধাহীন আত্মপ্রকাশ, আকাঙ্খার ঘোষণা, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত পট পরিবর্তনের সুখবোধ ও আনন্দানুভূতি । 'সমাজ বাস্তবতা ও ব্যক্তিক সংবেদনার মিথষ্ক্রিয়ায় সত্তরের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর সংঘ শক্তির উত্তাপ ফুরিয়ে যেতে না যেতেই ব্যক্তির আত্ম প্রক্ষেপ, আমিত্ব চেতনা ও অতল অসীম নৈঃসঙ্গ্যবেদনা প্রধান হয়ে উঠলো । এই নিঃসঙ্গতার ভেতরে যে বিচ্ছিন্নতা সমাজ মানুষের যাপিত জীবনে বাসা বাঁধে, তাও যেন সর্বগ্রাসী এক সংক্রামক ব্যাধি ।'[১২] তা সত্ত্বেও আমরা এ সময় পর্বের কবিতায় দেখি বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির আকুল আকাঙ্খার কথা, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে জেগে ওঠার বিপুল বাসনার কথা । মামুন মুস্তফার কাছ থেকে ধার নিয়ে বলি, 'নিঃস্ব মানুষের ক্লান্তি আর ছিন্নমূল প্রাণের উৎসমূলে নিঃসঙ্গ মানুষের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষে সত্তরের কবিরা প্রায়ই অবগাহন করেন সংঘশক্তির অর্ণবে, তুলে আনেন সেখান থেকে প্রবহমানতা আর প্রত্যয় ও প্রত্যাশার অফুরান শক্তি উৎস ।' ।[১৩]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে, মুক্তিযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কবিতায় কবিরা বয়ে এনেছিলেন এক স্বতন্ত্র স্বর । মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত

স্বাধীনতার আনন্দ-গর্ব-উল্লাস স্বাধীনতা উত্তরপর্বে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবদমনের ভেতরে ক্রমশ বিলীয়মান, সেই আদর্শগত ঐক্যের ভাঙনের মুখে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা ছিলেন মূলত 'প্রগত চেতনার' শব্দশিল্পী । এখানেই তাঁদের স্বাতান্ত্রিকতা । তাই সময়ের স্বরক্ষেপণে ওপার বাংলার সত্তরের কবিতা আপন বৈশিষ্ট্যে পূর্ববর্তী রবীন্দ্র প্রভাবিত ও রবীন্দ্র প্রভাব বলয়ের বাইরের কাব্যধারা এবং সাত চল্লিশের দেশভাগের পরে পঞ্চাশের কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতা-নির্দেশক ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের ওপার বাংলার কবিতায় ফুটে উঠেছিল সদ্য স্বাধীন দেশের জল ও মাটির কথা, যুদ্ধ ও সংগ্রামের স্মৃতি । একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেও সেই সময়ের কোনো কোনো কবি নিজস্ব ওজস্বিতায় দেদীপ্যমান আছেন । আবার অনেকেই ফুরিয়ে গেছেন ইতিমধ্যে । তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা 'উজ্জ্বল ও অন্ধকার' সময়ের যে অভিজ্ঞতা তা এই যুদ্ধোত্তর কবিগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের প্রশ্নে অনিকেত বাস্তবতায় নিক্ষেপ করেছিল ।

[৩]

ঊনিশশো সত্তর-এ যে সময়ের স্বর, স্বরান্তরে তার অন্যতর ক্ষেত্র রচিত হয়েছে । কথাটা এভাবেও বলা যায়, সময়ের তাগিদেই অনেক কবি আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতায়, কবিতা থেকে প্রতিকবিতায়, 'নর-বাদ' থেকে নারীবাদের বিচ্ছিন্ন প্রকাশে দৃষ্টির সীমানা প্রসারিত করেছেন ।

বলা বাহুল্য, বিংশ শতকের সাতের দশকটি বড় সুখের ছিল না । 'সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় আনন্দের সময় নয় । গলির মোড়ে আঁধার ঘনিয়ে এলেই পথঘাট শুনশান, গৃহস্থের জনালাগুলো আধবোজা, তার আড়ালে ত্রস্ত ফিসফাস । আর এই সবের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কালো পুলিশ গাড়ির আচমকা আনাগোনা, আলকাতরা ছোপানো টাটকা দেয়াল লিখনের আশে পাশে সন্দেহজনক স্তব্ধতা । প্রতিবেশীর ছাদ তাক করে চমকে ওঠা টর্চের আলো, অনেকগুলি পায়ের এলোমোলো দুদ্দাড় ছুট । দূরে কোথাও

গুলি বা বোমার শব্দ, আর্তনাদ । ..... এই নৈশ কোলাজ শেষ হয়ে গেলে পরদিন সাধারণত সত্য-মিথ্যা-অর্ধসত্যে ঠাসা নানা খবর, খুনের পাইকারি হিশেব পাওয়া যেত, যেন আবহওয়া দপ্তরের পরিসখ্যান- এমনই নিস্পৃহতায় । এই চলেছিল তখন দিনের পর দিন । তথাকথিত মুক্তির দশক এসেছির গণহত্যা-গুপ্তহত্যা-বোমা-পাইপগান-মিসা-থার্ডডিগ্রি-পাড়াছাড়া হবার ঘটনা ও দুর্ঘটনা সঙ্গে নিয়ে । একদিকে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে নিবেদিত যৌবন, গ্রাম নিয়ে শহর ঘেরার সংকল্প । বন্দুকের নলই শক্তির উৎস – এমনই বীরোচিত ভ্রান্তি; অন্যদিকে অন্তর্ঘাত, অতিরেক, আদর্শচ্যুতি, অতএব, নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নগ্নতম প্রকাশ । সব মিলিয়ে স্বদেশ-সময়ের মনিবন্ধে অভূতপূর্ব উত্তেজনা- স্ফিগমোম্যানোমিটারের কাঁটা ঊর্ধ্বমুখী ।

মুক্তিযুদ্ধ তখন বাইরেও । প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান অনেক রক্তের মূল্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হয়ে উঠতে চলেছে, চলছে খান সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ । এপারেও জাতীয়তাবোধ লাগামছাড়া, আকাশবাণীর নব ঘুরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুজিবুর রহমানের আবেগী উচ্চারণ শুনতে উচাটন জনগণমন । দেশে গণতন্ত্রহত্যা এবং একটু দূরে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম – এই বিপ্রতীপ পরিচয় নিয়ে এসেছিল সাতের দশক, ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে কালের মন্দিরা বেজেছিল কর্কশ সপ্তম সুরে; চল্লিশের পর এত ঘটনা বহুল সময় আর প্রত্যক্ষ করেনি স্বদেশ ।

সত্তরের গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল সাতষট্টিতেই – নকশালবাড়িতে কৃষক হত্যা ও তারপর চীন-ভারত বৈরী সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয়বার পার্টি ভাগ থেকে বাহাত্তরের প্রাদেশিক নির্বাচন পর্যন্ত তার একটি সর্গ । বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত আর একটি এবং সাতাত্তর থেকে আশির সূচনা অবধি সময়ের তৃতীয় বিভাগ । মূলত রাজনৈতিক এই বিভাজনকে মাথায় রাখলে এই সময়ের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চরিত্র বুঝে নেওয়া যেমন সহজ হয়ে যায়, বোঝা যায় যেমন রূপান্তরের রূপরেখাটিকে, তেমনই সাহিত্য মূল্যায়নেও কিছু বাড়তি তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় ।'[১৪]

এই সময়ের কবিতায় বিপ্লব ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিধাদ্বন্দ্বময় ঐকতান শোনা গিয়েছিল ।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে গড়ার মুখপাত্র হিশেবে সেদিন 'অনীক', 'প্রস্তুতি পর্ব', 'স্পন্দন', 'ম্যানিফেষ্টো' প্রভৃতি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কবিদের মানস-ক্ষেত্র গঠনেও এই সব সাহিত্য-পত্রিকার পাতা ছিল মূল্যবান।

এপার বাংলায় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ কবির সংখ্যা কম নয়। এঁরা হলেন নির্মল হালদার, বীতশোক ভট্টাচার্য, পার্থ প্রতিম কাঞ্জিলাল, রণজিৎ দাশ, দেবদাস আচার্য, অমিতাভ গুপ্ত, সুব্রত রুদ্র, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র, সুশীল পাঁজা, কমল চক্রবর্তী, তুষার চৌধুরী, অজিত বাইরি, সুজিত সরকার, শ্যামল কান্তি দাস, অনন্য রায়, জয়া মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমক দাস, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা মহাপাত্র, অরণি বসু, একরাম আলি, সুরজিৎ ঘোষ, ব্রত চক্রবর্তী, রমা ঘোষ, ধূর্জটি চন্দ, নিশীথ ভড়, জয় গোস্বামী, মৃদুল দাশগুপ্ত, সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয়দেব বসু, রাহুল পুরকায়স্থ,, সংযম পাল, নাসের হোসেন, তমালিকা পন্ডাশেঠ, সুতপা সেনগুপ্ত, জহর সেন মজুমদার,অরুণাংশু ভট্টাচার্য, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, মহুয়া চৌধুরী, শ্যামল জানা, অঞ্জনা বিশ্বাস, রত্নাংশু বর্গী, বিজয় সিংহ, রূপা দাসগুপ্ত, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদীপ ঘোষ, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বীথি চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী ঠাকুর, বিভাস রায় চৌধুরী, পৌলমী সেনগুপ্ত, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, যশোধরা রায় চৌধুরী, তীর্থঙ্কর মিত্র, সার্থক রায় চৌধুরী, শ্রীজাত, মন্দা ক্রান্তা সেন, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাম্যব্রত জোয়ারদার, প্রসূন ভৌমিক, রূপক চক্রবর্তী, রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মাজী, আবির সিংহ, তিলোত্তমা মজুমদার, অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতুল দত্ত, রুদ্রপতি, পার্থ শর্মা, অভীক মজুমদার, সেমন্তী ঘোষ, সুমিতেশ সরকার, শুভাশিস চক্রবর্তী, অনির্বাণ দাম, জয়দীপ ঘোষ প্রমুখ। স্থির জানি, অনেক নাম বাদ থেকে গেল। হ্যাঁ, সত্তরের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি জয় গোস্বামীর নামও।

প্রত্যয় এবং ঘৃণার অনুভূতিমালা কবিতা হয়ে গেছে সুশীল পাঁজার কলমে। সত্তরের নিদারুণ কালবেলায় বঙ্গভূমি তাঁর কাছে স্বদেশ মনে হয়নি, মনে হয়েছে মৃত্যু-উপত্যকা। নির্মাণের সুঠাম লাবণ্যে , ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসের জোরকে প্রকৃত কবিতায় রূপান্তরিত করার দক্ষতায় সব্যসাচী দেব এই সময়ের অগ্রগণ্য কবি। বিপুল চক্রবর্তীর

কবিতায় চারণের উদাত্ত আহ্বান, সুর ও স্বরের মেলবন্ধন। মৌলিকতার গুণে, শব্দ সচেতনতার গুণে রণজিৎ দাশের কবিতা বিশেষভাবে প্রাণময়। অমিতাভ গুপ্তের কবিতায় দেশজ প্রতিকৃতি, পৌরাণিক উল্লেখ এবং সেই সবকিছুকে নিজস্ব মননে জড়িয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুবোধ সরকারের কবিতায় শক্তিমান বিচিত্রমুখী ভাবনায় সুররিয়াল জগৎ গড়ে ওঠে অনায়াসে। মৃদুল দাশ গুপ্তের কবিতা নিটোল, বাকসংযমে স্বল্পভাষ-যেখানে আবেগ আছে, আকুলতা -আবিলতা নেই। জয় গোস্বামী অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছেন তাঁর আবেদনে, বাচনের স্পর্শকাতর বিন্যাসে, ছান্দসিক নির্মাণে, আত্মকরুণা পরায়ণ বেঁচে থাকার বৈশিষ্ট্যে। বীতশোক ভট্টাচার্য শব্দকে ধ্বনি ও অর্থের নিক্তিতে মেপে নির্বাচন এবং ব্যবহার করেন। মিথ্ থেকে মনস্তত্ব, ফিজিক্স থেকে ফিলোজফি-সব কিছুকে কবিতায় মিলিয়ে বীশোকের সৃজন-কথা। তুষার চৌধুরীর কবিতা রাগে- অনুরাগে, বিদ্রুপে-বিষাদে ভিন্নধর্মী। শক্তিমান কবি শ্যামল দাসের কবিতায় পাই জীবনের এক সহজিয়া সজীবতা। সুব্রত রুদ্রের কবিতায় কোথাও আছে নাগরিক রূপটান, কোথাও বা ভরাট প্রেম, কোথাও প্রতিবাদ, কোথাও ভরসা-সান্ত্বনা। অজিত বাইরীর কথন ভঙ্গিমার মধ্যে অহেতুক নাটুকেপনা নেই। প্রথম দিকে তাঁর কবিতায় যে শাব্দিক উদ্দমতা, কালক্রমে তা শমিত হয়েছে। নির্মল হালদারের কবিতায় কোনও অলংকারিক ভনিতা নেই। কবিতায় যা বক্তব্য, সরাসরি তা বুকে ঢুকে যায়। আলোচক-সম্পাদক কবি সুরজিৎ ঘোষের কবিতা পরিমার্জিত ও দেশি ভাবানুসঙ্গে স্পষ্ট। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কবিতা প্রতীক সমৃদ্ধ। অরণি বসুর কবিতায় আছে কৌতুকের আবহ, ব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় পাই বুদ্ধিদীপ্তির স্পষ্টতা। জয়া মিত্রের কবিতায় আছে অশেষ জীবন কথা - যে জীবন সম সাময়িক অন্ধকার ছেড়ে আলোর দিকে উধাও হতে চায়। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীবাদ অথবা স্বাধিকার প্রত্যাশার দাবি প্রথম থেকেই স্বাক্ষরিত। রমা ঘোষ তথা কথিত নারী-বাদের বাইরে দাঁড়িয়ে কবিতায় এনেছেন সমাজের কথা, সময়ের কথা। অনুরাধা মহাপাত্রের কবিতায় গ্রামীন লোকাচার ও লোক-কৃত্য সৃষ্টিশীল কবিত্ব শক্তিতে উপস্থাপিত। পিনাকী ঠাকুরের কবিতা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার মতো কোলাজধর্মী।

কাটা কাটা বাক্য আর ছেদ-যতি চিহ্নে তিনি কাব্যকায়া নির্মাণ করেন। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সাধ আর স্বপ্নভঙ্গ দিক চিহ্নের মতো স্পষ্ট। মন্দাক্রান্তা সেন মূলত প্রেমের কবি। তাঁর ভালোলাগা কথাগুলি তিনি সহজ, সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কবিতায় পরিবেশন করেছেন। পৌলমী সেনগুপ্তের কবিতা সহজ সরল। তাঁর কবিতায় একজন অনুভুতিশীল মেয়ের একান্ত জগৎটি ধরা পড়েছে। তীর্থঙ্কর মৈত্রের কবিতা স্পর্শকাতর অনুভূতিতে ভরা। তাঁর কবিতা দারুণ রোমান্টিক। যশোধরা রায় চৌধুরীর কবিতায় নব্বইয়ের জটিলতা আর 'শীতল সন্ত্রাস'। সাম্য ব্রত জোয়ারদার নিজের সময়ের যন্ত্রণায় শুধু কাতর হননি, নতুন দিনের স্বপ্নেও বিভোর হয়েছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় আছে রাজনৈতিক আধিপত্যবাদীদের উদ্দেশ্যে তীব্র স্যাটায়ার। প্রসূণ ভৌমিক আবেগে, অস্মিতায়, ইডিয়মে নব্বইয়ের নিজস্ব স্বরে কথা বলেছেন, রূপক চক্রবর্তী সময়ের নিখুঁত জ্যামিতিকে কাব্যিক ভাষায় জীবন্ত করে তুলতে পারেন।

বিশ শতকের নয়ের দশক। এ সময়ের কবিদের অনেকেই 'একবিংশের আলো'। এদের প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের অভিমত, 'নব্বইয়ের কবিরা একবিংশের আলোয় অনেককে দিয়ে লিখিয়ে নেবে এই বেয়াড়া সময়ের স্বরলিপি ও সোনাটা। কবিতার অনেক পাঠক-সমালোচক ঘুরে ফিরে আসবেই। নব্বইয়ের চোরাটানে, এই সময়ের কবিরা সেই রকম গুপ্তধন রেখে যাচ্ছে সময়ের এই এক শিলা পাথরের নিচে, গোপনে। একবিংশ শতকের কোনো দক্ষ নাবিক লেখালেখির দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে হয়তো ধাক্কা খাবে সেই পাথরে, দেখবে উনিশশো নব্বই তার কবিতা সমেত শুয়ে আছে মরা মুহূর্তের তলে-ডুবে থাকা টাইটানিকের মতো। তখন শুরু হবে আর এক উদ্ধারপর্ব।'[১৫] বলা বাহুল্য, আমরা এই পর্বেরই শরিক। সময়ের স্বর থেকে স্বরান্তরে চরৈবেতি মন্ত্রে আমাদের অব্যাহত অগ্রগমন।

বিশ শতকের শেষ দিক থেকে প্রায় প্রতিটি দশকে পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-দর্শনে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে এবং তার চাপে শিল্প-সাহিত্যের সাবেক চিন্তাও দুমড়ে মুচড়ে গেছে। দেশে দেশে লক্ষণীয় ভাবে বদলেছে বাংলা কবিতাও। কেননা বাংলা কবিতা এমন কিছু সৃষ্টি ছাড়া ব্যাপার নয় যে এই সর্বব্যাপী পরিবর্তমানতার মাঝে সে

একই রকম থেকে যাবে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের যে কবিতা তাকে 'আধুনিক' বিশেষণে বিশেষায়িত করার বিপক্ষে যাঁরা, তঁদের যুক্তি হল এই যে কবিতা তমোঘ্ন এবং কবি শর্তাধীন নন বলেই অ্যাকাডেমিক দাবিমতো আধুনিক কবিতায় তত্ত্বপরিচয়ের পরশ পাথর খ্যাপার মতো খোঁজার দরকার নেই। কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধি-অনুভূতি-অনুকম্পার সাবজেকটিভ ভুবনে অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলা এড়াতে একটা কোনো নির্ণায়ক, একটা পরিসীমার স্বচ্ছ বোধ চাই, কবিদের না হলেও আমাদের চাই-ই,যার দ্বারা, যার সঙ্গে তুলনা করে কবিতার ভালোমন্দ, পুরানো-নতুনের তফাৎকে এপাশ-ওপাশ থেকে, উপর-নিচ থেকে বিচার করা চলবে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাঙালি কবিরা বড় বেশি সাম্যে আস্থাবান, সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং ক্ষেত্র বিশেষে আশাবাদী। এ সময়ের কোনো কোনো কবি তাঁদের কবিতায় গোপন ও প্রকাশ্য যৌন কামনার অলজ্জিত 'উজ্জ্বল প্রকাশ' ঘটিয়েছেন। শব্দার্থের অভিধানিক বোধ ভেঙ্গে এঁদের অনেকেই নতুন শাব্দিক অনুসঙ্গ সৃষ্টি করে বুদ্ধিদীপ্ত ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ সময়ের অধিকাংশ কবিই উপমা-চিত্রকল্প নির্মাণের অবিশ্বাস্য উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউবা আবার প্রশ্নমুখর, প্রতিবাদী, বিদ্রূপপ্রবণ। সবচেয়ে বড় কথা, কাব্যকায়া নির্মাণে এঁদের মধ্যে কোনো ছুৎমার্গ নেই। বিষয় নির্বাচনে এবং তার প্রকাশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুদ্রা, মুদ্রাদোষের গণ্ডিকে এঁরা অতিক্রম করেননি। তাই সামগ্রিক ভাবে এ সময়ের কবিতা হয়েছে স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র্য, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতা নতুন ইডিয়মে, ছন্দে, ছন্দোহীনতায় সমন্বিত হয়েছে। কবিতায় এ এক নতুন বাক্-অভ্যাস। একে স্বীকার না করে পোস্ট-মডার্ণ কবিতার ভাবনা তো সম্ভব নয়। প্রকৃত প্রতিভাবান কবির কল্পনায় মিলেমিশে এ সময়ের বাংলা কবিতা স্বর থেকে স্বরান্তরে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন-স্বীকৃত-সার্বভৌম হওয়ার আগে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের যে কলরোল তার একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বাংলা দেশের সে সব কবিদের নাম প্রথমেই উচ্চারিত হয় তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নির্মলেন্দু গুণ। ১৯৪৫ সালে ও-পার বাংলায় তার জন্ম। ১৯৭২-এ তিনি লিখেছিলেন

বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী ' । মুজিবুর রহমানের আদর্শকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং অনেক কবিতায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের জয়গান গেয়েছিলেন এইভাবে, 'স্বাধীনতা তুমি দীর্ঘজীবি হও ।' যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের সাতের দশকের বাংলাদেশকে তিনি এইভঅবে তুলে ধরেছেন -

'এরকম বাংলা দেশ কখনো দেখনি তুমি
মুহূর্তে সবুজ ঘাস
পুড়ে যায় ত্রাসের আগুন লেগে
লাল হয়ে জ্বলে ওঠে চাঁদ ।'

(কাব্য ঃ 'না প্রেমিক-না বিপ্লবী'/ কবিতা ঃ 'প্রথম অতিথি')

নির্মলেন্দু গুণ-এর কবিতায় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকীয় সময়ের স্বর ও স্বরান্তর যথাযথ ভাষা পেয়েছে । স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কলম ধরে তিনি উচ্চারণ করেন সময়ের স্বর -

'জননীর নাভিমূল ছিন্নকরা রক্তজ কিশোর তুমি
স্বাধীনতা তুমি দীর্ঘজীবী হও ।'

(কাব্য / 'না প্রেমিক-না বিপ্লবী'/ কবিতা ঃ 'স্বাধীনতা উলঙ্গ কিশোরে')

আবার এইভাবে তিনি তাঁর কাব্যে সময়ের স্বরান্তর ঘটান -

যারা সমুদ্রের গর্জন থেকে মানুষের কান্নাকে পৃথক করতে পারে
তারাই মানুষ, আমি শুনতে চাইনা ভেসে আসা মহাসিন্ধুর গান ।

(কাব্যঃ প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতা সমগ্র / কবিতা ঃ 'হিমাংশুর স্ত্রীকে')

একদিকে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ-মথিত অন্তর, অন্যদিকে রোমান্টিক অনুভব কবি নির্মলেন্দু গুণকে সময়ের স্বর থেকে স্বরান্তরে নিয়ে যায় । বলা বাহুল্য, কোথাও তাঁর আত্মগত উচ্চারণ অস্পষ্ট নয় ।

বিংশ শতকের আটের দশকেই বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের কাব্যচর্চার ধারাটি ভিন্নপথ পরিক্রমা শুরু করে । আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাটি হয়ে ওঠে লিট্‌ল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক । ১৯৭০-এর রাজনৈতিক স্লোগান প্রধান বাক্-প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে, বাজারি পত্রিকার পণ্যমনস্কতা এবং ইউরোপ কেন্দ্রিক প্রভাব কাটিয়ে এক ঝাঁক

তরুণ কবি বাংলা কবিতায় ভীষণভাবে 'অভিজ্ঞা প্রয়াসী' হয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন কবিতার এক প্রাঞ্জল দ্বীপপুঞ্জ।

একথা স্বীকার করতে কারও দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয় যে, এককালে সিরিয়াস কবিতাকর্মীর সামনে প্রবল সব বিরোধীয় প্রতিপক্ষ বিদ্যমান ছিলো। যেমন ফেমিনিজম, গোঁড়া মাকর্সসিজম, হিংসা-উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত ও বর্ণবাদি যতো কুশ্রী অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও প্রভাব-বলয় বিস্তারের নানামুখি কুটাচার আর এসবের প্রতিরোধের জন্য দেশ প্রেমিক সংগ্রামিক রাজনীতির অবস্থান প্রভৃতি -যে কারণে কবি ও কবিতাকর্মীকেও তার সৃজনশীল অঙ্গন ছেড়ে প্রায়শই বৃহত্তর রাজনীতির আহ্বানে বা তাগিদে বিভিন্ন প্রতিরোধী লেখালেখি, মিছিল, সমাবেশ ও কালক্ষেপ করতে হয়েছে। আটের দশকে এইসব বিষয়ের বিভিন্ন বীভৎস ও সংক্রামক উপস্থিতি, অন্তত চল্লিশ, পঞ্চাশ-ষাট কিংবা সত্তর দশকীয় উন্মাদনার স্বরূপে ছিল না। তার অবয়ব ও কর্ম কৌশল সম্পূর্ণ বদলানো রূপ নিয়ে ছিল। ফলে এ সময়ের কবি ও কবিতাকর্মীর দ্বন্দ্বের চেতনা অন্যখানে, অন্যত্র। তার মানবিক অস্তিত্ব বিপন্নতাই ছিল তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে অস্তিত্বের অন্বেষাই এই সময়ের কবিতার প্রতিপাদ্য হবে —এটাই স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত। এই অস্তিত্ব অন্বেষু কবিতাবলীকে সনাক্ত করা চলে শেকড় অভিলাষী চেতনার কবিতা বলে। ব্যক্তিগত সনাক্ত করণ যা-ই হোক না কেন, এ সময়ের কবিতার মর্মবস্তু নির্যাস-প্রবণতা ও বহির্দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন এবং এক বৈ-নয় সেটি যে আবার অস্তিত্বের প্রয়োজনেই জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের সদর্থক জাগরণকেই দ্যোতিত করে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওপার বাংলার অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিতার চেতনা গ্রাম-বাংলার অগুন্তি মানুষের হতাশ্বাস ও চাপাপড়া বেদনার অনুভূতি ও 'মন্ময় দ্রোহ'কে শিল্পের মর্যাদায় প্রতিস্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। যে সব লিট্‌ল ম্যাগাজিন পূর্বোক্ত উদ্বুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে নৈতিকভাবে সামনে রেখে বাংলা কবিতার নতুন ধ্বনি ও শব্দগুচ্ছ, নতুন উপমা ও বাকপ্রতিমা, নতুন চিত্রকল্প ও নতুন ইডিয়মের আমেজ বয়ন করে চলেছিল সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল —

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | একবিংশ / | সম্পাদক | - খোন্দেকার |
| ২. | লিরিক / | ,, | - এজাজ ইউসুফী |
| ৩. | নিসর্গ / | ,, | - সরকার আশরাফ |
| ৪. | দ্রষ্টব্য / | ,, | - কামরুল হুদা |
| ৫. | আড্ডারু / | ,, | - জাফর আহমেদ |
| ৬. | গ্রন্থী / | ,, | - শামীম শাহান |
| ৭. | প্রতিশিল্প / | ,, | - মারফুল আলম |
| ৮. | ২৪০০ / | ,, | - কামাল রহমান |
| ৯. | জীবনানন্দ / | ,, | - হেনরী স্বপন |
| ১০. | মঙ্গলসন্ধ্যা / | ,, | - সরকার আমিন |
| ১১. | নির্ব্যাজ / | ,, | - লিয়াকত শাহ্ ফরিদী |
| ১২. | সৃষ্টি / | ,, | - প্রিয়ক রসিদ |
| ১৩. | বিকাশ / | ,, | - মোস্তাক আহমেদ দ্বীন |
| ১৪. | অর্কেষ্ট্রা | ,, | -রেজাউল করীম চৌধুরী |
| ১৫. | পুষ্পকরথ | ,, | - হাফিজ রসিদ খান |

প্রভৃতি।

কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে যে কারণে অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তা হল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের কবিতা চর্চায় বিশ শতকের সাতের দশকটি একারণেই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। পাকিস্তানী সৈন্যদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ঘৃণা যেমন কবিতায় এসেছে তেমনি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালি জাতির স্বপ্ন, হতাশা, আকাঙ্খা, অকৃত্রিম মমত্ববোধ, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকেই খুঁজে পাওয়া যায় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে। মুক্তিযুদ্ধের শরিক হয়ে কবিতা লিখেছেন শামসুর রহমান, আলমাহমুদ। শামসুর রহমানের কবিতা- গেরিলা, পথের কুকুর, তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি, আলমাহমুদের কবিতা- কারফিউ, অসহ্য সময় কাটে, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা-

তোমার আপন পতাকা, এখন সকল শব্দই, আলা উদ্দিন আল আজাদের স্বাধীনতা ওগো স্বাধীনতা, সৈয়দ শামসুল হকের-বেজান শহরের জন্য কোরাস, শহীদ কাদরীর কবিতা-নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমা, বেলাল চৌধুরীর কবিতা - মুক্তিযুদ্ধ, আসাদ চৌধুরীর - অজ্ঞাত শহীদ মুক্তি যোদ্ধার কথা, রফিক আজাদের - নেবে স্বাধীনতা, মোহাম্মদ রফিকের - আরজ আলির জন্য দ্বিতীয় গাথা, নির্মলেন্দু গুণের - আগ্নেয়াস্ত্র, মহাদেব সাহার- একজন মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরিতে, আবুল হাসানের- উচ্চারণগুলি শোকের, রবিউল হোসাইনের- ঝরে পড়ে, হুমায়ুন কবীরের- বাংলার কারবালা, মুহাম্মদ নুরুল হুদার-বাঙালির জন্মতিথি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্বর ও স্বরান্তরের ইতিহাস রচনা করে গেছে ।

## তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার


১. সেনগুপ্ত অমলেন্দু / জোয়ার-ভাটায় ষাট-সত্তর / পৃষ্ঠা ৮৬

২. ঘোষ গৌর কিশোর / 'দেশ' ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

৩. সুর অতুল / বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন / পৃষ্ঠা ৩৫৮

৪. চৌধুরী অজিতা / শব্দ ও ধ্বনি / জলজ (ত্রিপুরা)/ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা / ভাদ্র, ১৪০৮

৫. চক্রবর্তী সুমিতা , আধুনিক কবিতার চালচিত্র / পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪

৬. চক্রবর্তী সুমিতা , আধুনিক কবিতার চালচিত্র / পৃষ্ঠা ৫

৭. সামন্ত সুবল সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড)'/ পৃষ্ঠা ১১৩

৮. দাশগুপ্ত অমিতাভ / শ্রেষ্ঠ কবিতা / কবিতার নাম ঃ রক্ততট / পৃষ্ঠা ৯৯

৯. ঘোষ শঙ্খ / কাব্যগ্রন্থ ঃ দিনগুলি রাতগুলি'/ কবিতা 'সপ্তর্ষি' ।

১০. আলি আনোয়ার 'বাঙালি সংস্কৃতির ভিতর ও বাহির' (প্রবন্ধ) ।
কালি ও কলম / পঞ্চম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৪১৪ (বাংলাদেশ)

১১. তদেব / পৃষ্ঠা ১৫

১২. মুস্তাফা মামুন - 'সত্তরের দশকের কবিতার একটি অন্তরঙ্গ পাঠ'/
কালি ও কলম / পঞ্চম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৪১৪ (বাংলাদেশ)

১৩. তদেব / পৃষ্ঠা ৩৩

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায় হিমবন্ত - কবিতা নিয়ে (কবিতা ঃ সত্তর) / পৃষ্ঠা ১২০

১৫. তদেব / পৃষ্ঠা ১৫৯